স্বাধীনতার স্মৃতি - ১

# বিজয়ের মাস
# ও আমাদের রুমা আপা

আমাদের পাড়ার নাম উকিল পাড়া। প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে সারি সারি উকিল মোক্তারদের বাসা। আমরা বাবার সহকর্মী উকিল বা মোক্তারদের খালুজান আর ওনাদের স্ত্রীদেরকে খালাম্মা বলে ডাকতাম। মাঝে তিন ঘর হিন্দু উকিল পরিবার ছিল। ওনাদের আমরা কাকা আর কাকীমা বলে সম্বোধন করতাম। আমরা উকিল মোক্তারদের ছেলেমেয়েরা অনেকটা চাচাত খালাত ভাইবোনেরদের মত এক পাড়ায় বড় হয়েছি। মফস্বল শহরের বাসা; ফলফলাদির গাছ পালা, সান বাধাঁন পুকুর এইসব মিলিয়ে আমাদের প্রায় সবারই বসত বাড়ী। লক্ষী পূজায় নারিকেলের নাড়ু আর আমাদের ঈদের মিস্টি মিঠাই আদান প্রদান চলতো প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব সহাবস্হানে আমাদের বেড়ে উঠা।

১৯৭১ স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন শুরু হলো পাড়ার সবাই বাড়ীঘর ছেড়ে যে যেদিকে পারছে জীবন নিয়ে পালাচ্ছে। বড় আপা ছাড়া, আমাদের গোটা পরিবার প্রথমে দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ী, পরে নানা বাড়ীতে পাকাপোক্ত আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি তখন অনেক ছোট, কিন্তু পাড়ায় রাজনৈতিক একটা পরিবেশে বড় হয়ে উঠায় আমার রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা ভালই ছিল। সে যে কি এক ভীতিকর পরিবেশ। ঢাকা থেকে পায়ে হেটেঁ দলে দলে মানুষ জীবন নিয়ে বাড়ী ফিরছে। আর পাকবাহিনীর বিভৎস লোমহর্ষক অত্যাচারের বর্ননা দিচ্ছে। ঢাকার ঠাঠাঁরী বাজারে আগুন লাগিয়ে পুরো বাজার নাকি ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ঠাঠাঁরী বাজারে আমার আপন এক খালাত ভাইয়ের বড় চালের আড়ত ছিল। তার হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার মায়ের সে কি কান্না। পাশের বাসার সাগর ভাই চিটাগাং উনিভার্সিটিতে পড়তো। তারও কোন খবর নেই। খালাম্মা নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার মা আর অন্য খালাম্মারা মিলে তাকে সান্তনা দেবার চেস্টা করছিলেন আর আড়ালে নিজেদের চোখের জল মুচ্ছিলেন। পরে জানা গেল সাগর ভাই চিটাংগা থেকে ইন্ডিয়া চলে গেছেন এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

খবর পাওয়া গেল পাকবাহিনী হিন্দু পেলেই খতম করছে। হিন্দু কাকা কাকীমারাও আমাদের মত বাড়ীঘর ফেলে প্রানের ভয়ে তাদের গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। পাড়ায় রয়ে গেলেন একজন খালুজান-- ডাকসাঁইটে মোক্তার যিনি মুসলিমলীগার এবং এক সময় মুসলিমলীগের টিকিটে এম এন এ ইলেকসন করে নৌকার কাছে হেরেছেন। উনি শান্তি কমিটির সাথে সম্পৃক্ত হলেন। আমরা নানা বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। মামারা গ্রামে প্রতাপশালী এবং অবস্হাসম্পন্ন। বড় বড় অনেকগুলো ঘর, তার মধ্যে দু একটা টিনের দোতলা, বিশাল উঠান, অনেক লোকজন কাজ করে। আমাদের পাশাপাশি আরও কয়েকটা পরিবার প্রানের ভয়ে শহর ছেড়ে আমাদের নানাবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। হিন্দু এক ডাক্তারের পরিবারও ঐসময় ঐ বাড়ীতে আমাদের সাথে আশ্রয় নিয়েছিল।

---

**আতিক রহমান** / বউমন্টহিল, ১৪ ডিসেঃ ২০১১

আমরা ছোটরা সারাদিন খেলতাম। পড়াশুনার তাগিদ নেই, এ এক অফুরন্ত ছুটির দিন। আমরা ছেলেরা দীঘির ধারে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতাম। কাচাঁ খেজুর বাঁশের চিকন নলে ঠুঁকিয়ে অন্য প্রান্তে শক্ত কাঠি ঢুকিয়ে চাপ দিলে গুলির মত আওয়াজ করে খেজুরের বিচি ছিটকে পড়তো। মুখে উচ্চারন করতাম ঠ্যা, ঠ্যা, ঠ্যা গুলির শব্দ; আর বোমার আওয়াজের ভুম ভুম। কি দারুন উত্তেজনা। এভাবে দু'তিন মাস কেটে গেলো। পাকিস্তান আর্মি মহকুমা শহরে পত্তন গেড়েছে। পরিস্থিথি অনেকটা স্বাভাবিক হতে লাগলো। মানুষজন আস্তে আস্তে শহরে ফিরতে শুরু করলো। আমরাও বাসায় ফিরলাম। ফিরে এলো না শুধু আমার বড় আপা। দুলাভাই সরকারী চাকুরীজীবী ছিলেন। আপা আর সন্তানদেরকে নিয়ে দুলাভাই গেলেন তাদের গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে। শহর থেকে প্রায় ৪০/৪৫ মাইল দূরে মেঘনার কোল ঘেঁষে গাছগাছালিতে ঢাকা দুলাভাইদের গ্রামের বাড়ী। ওসময় হঠাৎ করে গ্রামে মহামারি আকারে কলেরা দেখা দেয়, আর তাতে প্রান হারান আমার আপা সাথে তার  ছুটো দুটো ফুটফুটে বাচ্চা। একটা ভাগ্নে একটা ভাগ্নি আর আপা শুধু দিনের ব্যবধানে ডায়রিয়ায় মারা গেলো। সেসময় খাবার স্যালাইন, মোবাইল ফোন এসব কিছু ছিল না, এমনকি আপার মৃত্যু সংবাদটি আমাদের আশ্রয়স্থলে পৌঁছেছে পায়ে হাটা একলোক মারফত মৃত্যুর বেশ কিছু দিন পরে। কি যে দুঃখ আর বেদনা গোটা পরিবারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো বেশ কিছুকাল ধরে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

আস্তে আস্তে পরিবেশ স্বাভাবিক হতে শুরু করলো। আমরা আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। আমাদের মুসলিমলীগের খালুজান আমার বাবাকে আশ্বস্তের বানী শুনালেন "উকিল সাহেব--কোন ভয় নেই, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান"। ওনার একছেলে আমার সহপাঠি। আমরা দু'জন স্কুলে যাই; মর্নিং স্কুল। কিন্তু আপারা যাননা। কারন জানিনা। তবু এটুকু বুঝতাম আপারা মিলিটারীদের আমাদের চাইতে অনেক বেশী ভয় পান। একদিন মেঝো আপা আম্মাকে বলতে শুনেছি; "যদি মিলিটারীরা বাসায় ঠুকেই পড়ে আমরা কোরআন শরীফ বুকে চেপে ধরে প্রতিরোধ করবো, ওরা তো মুসলমান, কোরআন শরীফকে তো আর ওরা অসম্মান করতে পারবে না"। রুমা আপা মুসলিমলীগ খালুজানের উঠতি বয়সের মেয়ে। আমার বোনদের সমবয়সী। অমায়িক তার ব্যবহার। প্রায়ই সহপাঠি ভাইয়ের সাথে স্কুল যাবার সময় আমাকে সকালে শীতের পিঠা এটা ওটা খেতে দিতেন।

ভরা বর্ষা, জুলাই আগস্ট মাস, যুদ্ধের ডামাডোল জোরেশোরে বাঝছিল। বড়রা সবাই সন্ধ্যায় লুকিয়ে লুকিয়ে রেডিওতে বিবিসি'র বাংলা অনুস্ঠান শুনতো, আর দুপুরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের বিবরন। আমার মা স্বাধীন বাংলা বেতারের এম.আর আখতার মুকুলের রসে ভরা চরমপত্র কি যে উপভোগ করতেন - তা তার শিশুসুলভ হাসি দেখে আমি স্পস্ট বুঝতে পারতাম। পাকবাহিনী এখানে ওখানে মার খাচ্ছিল, সাথে সাথে ওদের অত্যাচারের মাত্রাও বেড়েই চলছিল। সন্ধ্যায় মেশিন গান হাকিয়ে ট্রাকভর্তি মানুষ একরশিতে পেচিঁয়ে বেঁধে নিয়ে যেতো খেয়াঘাটে, আর ঘন্টাখানেক বাদে খালি ট্রাক নিয়ে ফিরে আসতো পাকবাহিনীর দল।

---

**আতিক রহমান** / বউমন্টহিল, ১৪ ডিসেঃ ২০১১

এরিমধ্যে একদিন খবর এলো আমাদের পাড়ার হিন্দু উকিল কাকার ছেলে বিষ্ণুদাকে মিলিটারীরা ধরে নিয়ে গেছে তাদের লুকোনো আশ্রয়স্থল গ্রামের বাড়ী থেকে। পাড়ার সবাই হতবিহ্বল। আর রক্ষে নেই। একে হিন্দু, তার উপর যুবক। বিষ্ণু'দা শহরের একটি হাইস্কুলের অংকের মাস্টার ছিলেন যাকে সে সময় বলা হতো বিএসসি টিচার। কেননা উনি বিএসসি পাশ করে শিক্ষক হয়ে ছিলেন। পাড়ার মুরুব্বিরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন বিষ্ণু'দার মুক্তির জন্য খতম ইউনুস পড়তে হবে। খতম পড়া হয়েছিল কিনা মনে নেই, তবে মহিলা পুরুষ সবাই মিলে যে দোয়া করেছিল তা স্পষ্ট মনে আছে। অন্যদিক মুসলিমলীগ খালুজান তার তদবিরের জোর সবটুকু খাটিয়ে বিষ্ণু'দাকে মুক্ত করিয়ে আনলেন। সূরা ইয়াছিনের জোর আর খালুজানের তদবীরে বিষ্ণু'দা ছাড়া পেলেন। হিন্দুর ছেলের বিপদ মুক্তির জন্য মুসলমানের খতমে ইউনুস পড়া, এ এক বিরল মানব বন্ধন; এইত মনূষত্ব। মুক্তির পর বিষ্ণু'দা পাড়ার সবার সাথে দেখা করতে এলেন। ইয়া বড় দাড়ি, পরনে পাঞ্জবী–কে বলবে সে হিন্দুলোক। এক রাজাকার ওনাকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

খালুজান মুসলিমলীগ করলেও মানুষ হিসেবে খারাপ ছিলেন না। বিষ্ণু'দার মত আরও অনেক লোকের জীবন বাঁচাতে এবং হিন্দু সম্পত্তি রক্ষা করতে সাহায্য করেছেন। আমরা উকিল পাড়া বাসিরা মোটামুটি যুদ্ধের আলামত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। নভেঃ মাস। স্বাধিনতার বোধহয় আর বেশী বাকী নেই। হঠাৎ খুব একসকালে খবর এলো মুসলিমলীগ খালুজানের একমাত্র মেয়ে রুমা আপা মারা গেছেন। খবরটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কি করে ১৮/১৯ বছরের একটি মেয়ে হঠাৎ করে মারা যায়। দৌড়ে ওনাদের বাসায় গেলাম। হ্যাঁ, খবরটা সত্যি, রুমা আপা মারা গেছেন। ঐতো বিছানার চাদরে ঢাকা ওনার লাশ। আমার সহপাঠি রুমা আপার ভাইটি হাউমাউ করে কাঁদছে। ওনার বড়বড় কয়েকটি ভাই ছিল। ভাইরা কাঁদছে আর ক্রন্দরত বাপকে সবাই কিসব বলে তিরস্কার করছে। খালুজান কাদঁছেন আর আক্ষেপ করে বলছেন আমি "বুঝতে পারিনি ওরা এত খারাপ, এতবড় পশু, এত অমানুষ"। আমরা সবাই জেনেছি অসুস্থতার কারণে রুমা আপা হঠাৎ করে মারা গেছেন। তড়িঘড়ি করে দুপুরের মধ্যে রুমা আপাকে দাফন করা হলো। পুরো পাড়াটা যেন ভরা অমবস্যার কালো আঁধারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো সেদিন।

দেশ স্বাধীন হলো, মুক্তিবাহিনী মুসলিমলীগ খালুজানকে আটক করলো। কিন্তু তাকে ছেড়ে দেয়া হলো অল্প দিনের মধ্যে, এর পিছনে রুমা আপার অকাল মৃত্যু কাজ করেছে বলে শুনেছি। বড় হবার পর রুমা আপার মৃত্যু রহস্য আমাদের কাছে পরিস্কার হয়েছে। রুমা আপার মত বহু রুমা আপারা স্বাধীনতার জন আত্মাহুতি দিয়েছেন। আসুন বিজয়ের এই মাসে আমরা তাদের শ্রদ্ধা জানাই।

**আতিক রহমান** / বউমন্টহিল, ১৪ ডিসেঃ ২০১১